ছোটোগল্পের অন্নদাশঙ্কর

উজ্জ্বল শীল

পুনশ্চ

॥ ভূমিকা ॥

সাহিত্যচর্চাকে কেন্দ্র করে মানুষের চিন্তাশক্তি বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র মনোজগতে তাকানোর সুযোগ পেয়েছে। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধরনের মুক্তচিন্তা ও মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। বাঙালি তথা ভারতীয় জাতীয় জীবনে যার একান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন আজও। হৃদয়হীনতা অমানবিকতা ঐক্য বিনষ্টির ষড়যন্ত্র ও প্রগতিশীল চিন্তার অভাব যখন মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করতে সচেষ্ট তখন দরকার হয় শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ। যিনি সত্যের জয় সৌন্দর্যের জয় ঘোষণা করবেন। মানুষকে দেখাবেন নতুন আলোকিত পথ। মুক্তমনন ও চিন্তাশীলতার দিক থেকে যে কয়েকজন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম অন্নদাশঙ্কর রায়। বাংলা সাহিত্যে অগণিত গল্প লেখা হয়েছে। খ্যাতিমান গল্পকারদের আসরে জায়গা করে নেওয়ার দক্ষতা অন্নদাশঙ্করের ছিল। তিনি *হে লেখক* ছড়ায় বলেছেন—'যাই লেখ, যাই কর,/দৃষ্টি রেখো দূর লক্ষ্য পরে/দৃষ্টিচ্যুত সৃষ্টি দিয়ে/আয়ু ভরে, হৃদয় না ভরে।' তাঁর সাহিত্যিক মনন দূর লক্ষ্যাভিমুখে দৃষ্টি রেখে হৃদয়ভরা শিল্প সৃষ্টি করেছে। তাঁর লেখা গল্পগুলি সম্পর্কেও একথা খাটে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস নিয়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে গিয়ে তাঁর গল্পগুলির দিকে দৃষ্টি যায়। প্রশ্ন জাগে অন্নদাশঙ্করের গল্পগুলি নিয়ে সেরকম বিস্তারিত আলোচনা বা উচ্চবাচ্য নেই কেন? অথচ গল্পগুলি মানুষের জীবনদর্শন, সমাজজীবনের ও তার পরিবর্তনশীলতার এবং মননের দর্পণ! মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের প্রতি যেন দায়বদ্ধতা নিয়ে গল্পগুলি লেখা। একথা ভেবেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা।

দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, দীর্ঘদিন বিদেশি শাসনাধীন থাকার পর যন্ত্রণাময় দেশভাগের স্বাধীনতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক প্রভৃতি দিক থেকে যে ভাঙাগড়া সেখানে মানুষ অনেকটাই অসহায় ও দিশেহারা। প্রগতিশীল চিন্তার আলোকে জীবনের মূলস্রোতে মানুষকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নানান জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হবে। এই দায়িত্ব সাহিত্যিকদেরও। এই দায়িত্ব অন্নদাশঙ্কর রায়েরও। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের গল্পেও তার

প্রতিফলন। আমি সেই দিকেই গল্পগুলি ধরে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটির আলোচনা যত এগিয়েছে এবং শেষ করেছি, মনে হয়েছে আরও কিছু বলার ছিল। দৃষ্টির ব্যাপ্তি তো সীমাহীন। শেষ হয়েও হল না শেষ যে একটু অতৃপ্তি থেকে গেল তা পূর্ণতাদানের চেষ্টা পরবর্তীকালে করব বলে আশা রাখি।

কোনো নির্মাণ কার্যই একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপায়ণে অনেককেই আন্তরিকভাবে কাছে পেয়েছি। সর্বাগ্রে যাঁকে স্মরণ করব তিনি আমার জীবনে আলোর পথের দিশারী। তাঁর উদ্যোগ প্রচেষ্টা পরামর্শ ছাড়া এই গ্রন্থ কখনোই সম্ভব হত না। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় প্রণম্য স্যার অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। স্যারের প্রতি আমার আন্তরিক প্রণাম। এছাড়াও অনেকের প্রেরণা ও সহযোগিতা কৃতিত্বের দাবি রাখে। বিশেষ করে স্মরণীয় আমার বাবা-মা ও দাদা-ভাইদের কথা। তাদের প্রতি ও আমার প্রণাম ভালোবাসা। এছাড়া বন্ধু অধ্যাপক উত্তম দাসের উৎসাহ ও সহযোগিতা গ্রন্থটির কাজ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণারত অমিত দেবনাথ, ইউনুস মিঞা, তুফান রায়, প্রসেনজিৎ দাস, এহেসানুল্লা হক, তাপস মণ্ডল, দীপ চন্দ, শিবনারায়ণ রাউত প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে পুনশ্চ প্রকাশনীর সন্দীপ নায়ক মহাশয় যেভাবে আগ্রহের সঙ্গে গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছেন তা আমার কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। সচেতনতা সত্ত্বেও ভুল ত্রুটি থাকলে পাঠকগণ নিজগুণে মার্জনা করবেন এইটুকু প্রত্যাশা রাখি। পাঠক গবেষকগণ গ্রন্থটি পাঠে আনন্দ পেলে ও উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক। সকলের প্রতি নমস্কার শ্রদ্ধা ভালোবাসা।

আগস্ট, ২০১৮ — উজ্জ্বল শীল

মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার

সূচিপত্র

অন্নদাশঙ্কর রায়ের শিল্পীমানস : প্রসঙ্গ গল্প	১১
অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্প : জীবনবোধ	১৭
অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্প : সময়, দেশভাগ ও প্রতিক্রিয়া	৪৬
অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্প : দেশকালের প্রেক্ষিতে নারী	৬৩
অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্প : সমাজ-সংস্কৃতি	৮১
অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্প : প্রেম	৯৫
অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্প তালিকা	১০৯

॥ অন্নদাশঙ্কর রায়ের শিল্পীমানস : প্রসঙ্গ গল্প ॥

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৫ মে ১৯০৪—২৮ অক্টোবর ২০০২)-এর প্রায় শতবর্ষ সীমানায় যে জীবনচর্যা তাকে মহাজীবন বলতে হয়। ওড়িশার দেশীয়রাজ্য ঢেঙ্কানালে তাঁর জন্ম। বাঙালি এই ব্যক্তি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ও স্বাধীন ভারতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থলে আই. সি. এস প্রশাসক হিসেবে বিচরণ করেছেন। প্রশিক্ষণ সূত্রে ইংল্যান্ডের মাটিতে পদার্পণ করে ইউরোপকে চিনেছেন উপলব্ধি করেছেন। তিনি শুধু একজন প্রশাসক নন, একজন সাহিত্যিক জীবনশিল্পী। মননশীলতা ও জীবনধারণের বিশালতায় বিশশতকের বাঙালি সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবসমাজের সত্যসন্ধানী প্রাণপুরুষ। মানুষের জীবনধারা, জীবনদর্শন, মুল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, সংস্কার, কুসংস্কার, শোষণ-উৎপীড়নের ঘাত-প্রতিঘাত মানুষের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে—তা তাঁর প্রবন্ধ উপন্যাস ছোটোগল্প ছড়া নাটক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনায়াসেই শিল্পরূপ পেয়েছে।

১৯১৪ সালে *সবুজপত্র* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে মুক্তচিন্তা ও মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরির পাশাপাশি অন্নদাশঙ্কর রায়ও পথ চলা শুরু করলেন। ওড়িয়া সংস্কৃতি ও বাঙালি পরিবারে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে তাঁর বেড়ে ওঠা। পরবর্তীকালে পড়াশোনা সূত্রে পাটনা, গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ জীবন পরিক্রমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরি গান্ধিজি লিও টলস্টয় গ্যেটে প্রমুখ ব্যক্তিত্বের ভাবধারায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। প্রবন্ধ উপন্যাস ছড়া কবিতা নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লেখক হিসেবে পারদর্শীতার পরিচয় দিলেও ছোটোগল্প তথা গল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে অবদান কম নয়। সমাজ সাহিত্য দর্শন সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতি প্রেম ইত্যাদি বিষয়গুলির সাথে মানবজীবন কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা তিনি স্বজ্ঞা ও মনন দিয়ে বিচার করেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ককে বারবার মেলাতে চেয়েছেন। চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তিধর্মীতাকে, বিচক্ষণতা ও বিচারশীলতাকে, নৈতিকতা ও মানবিকতাকে প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতায়, শৈলীতে ও শিল্পীত্বে গল্প রচনায় অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় উপন্যাস লেখায় যেমন কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই হাত দিয়েছিলেন গল্প লেখার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে তাঁর সেরকম আগ্রহ ছিল না। আসলে পরিকল্পনাহীনভাবে

বৃহৎ উপন্যাস রচনাই যখন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করেছিলেন তখন গল্পের প্রতি আগ্রহ কম থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু জীবনের চলমান পথে তো ঘটে চলে নানা ঘটনা। তাঁর মতো একজন বলিষ্ঠ প্রশাসক ও ব্যক্তিত্বের জীবনাভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি একসময় ছোটোগল্পের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। কেননা তিনি একজন জীবনশিল্পী। শুধুমাত্র *সত্যাসত্য*, *রত্ন ও শ্রীমতি*, *ক্রান্তদর্শী*র মতো বৃহৎ ভাবনার বৃহৎ উপন্যাস লিখলেই জীবনের সকল অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির যথার্থ শৈল্পিক রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক ছোটো ছোটো ঘটনাও লেখার বিষয়বস্তু হবে না কেন? তবে তাঁর অনেক গল্পেই রয়েছে এক একটা উপন্যাস রচনার রসদ।

অন্নদাশঙ্কর রায় সারাজীবনে ৯১টি গল্প লিখেছেন। ৯১টি গল্পের মধ্যে ৮৮টি গল্প বড়োদের জন্য। আর বাকি ৩টি ছোটোদের জন্য। বড়োদের জন্য লেখা ৮৮টি গল্পের মধ্যে ৮৭টি গল্প তিনটি সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প সংকলন গ্রন্থগুলি হল—*গল্প* (১৯৬০), *কথা* (১৯৭১) ও *কাহিনী* (১৯৮০)। এছাড়া ৪টি গল্প কোনো সংকলন গ্রন্থে স্থান না পেলেও ৯১টি গল্পই একত্রে *গল্পসমগ্র* বইতে মুদ্রিত। ইতিপূর্বে অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলীর তৃতীয়, নবম ও দশম খণ্ডে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছিল। গল্প সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে।

উপন্যাসের সঙ্গে ছোটোগল্পের প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—'উপন্যাসের সঙ্গে ছোটোগল্পের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়েরই প্রাণ একই জায়গায়, যেন তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডালপালা ছাঁটলে সে ছোট গল্প হয় না, ছোট গল্পকে পল্লবিত প্রসারিত করলে সে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশ-দ্বার খুলে দিয়ে বলে, বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড়। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায় আর বলে, পাঠক, যথেষ্ট দেখলে, আর দেখতে চেয়ো না। উপন্যাসকার ক্রমাগত সূতো ছাড়তে থাকেন, মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙায় তোলেন। ছোট গল্পকার জাল ফেলে, তখুনি তুলে নেন। ছোট গল্প হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সময়সাপেক্ষ, তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে।'[১] অন্নদাশঙ্কর রায়ের ঔপন্যাসিক সত্তা তো পুরোমাত্রায় ছিলই। সেইসঙ্গে গল্প সম্পর্কে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণাত্মক অভিমত ক্রমাগত গল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করে দেন। তিনি যে গল্পের আর্ট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন উপরিউক্ত মন্তব্যের ভিত্তিতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

দেশ-কাল তার সঙ্গে জড়িত মানুষের জীবন সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের যে জীবনাভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তা ব্যক্তিজীবন অতিবাহিত হওয়ার পথে একইরকম ছিল না। সর্বদা একইরকম থাকা সম্ভবও নয়। কোনো সাহিত্যিকেরই থাকাটা সাধারণত

অসম্ভব। কেননা মানুষের জীবন ও তার উপলব্ধি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে থাকে না। অন্নদাশঙ্করের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটা ব্যতিক্রম নয়। ফলস্বরূপ গল্প শিল্প মেজাজ মূলত বড়োমাপের উপন্যাস লেখার। প্রথম দিকে *সত্যাসত্য*-এর মতো বৃহৎ উপন্যাস লেখায় হাত দিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে ছোটোগল্প লেখার সময়ও পাননি। আর আগ্রহও ছিল না। কিন্তু গল্প সম্পর্কে ধারণা ছিল। তিনি বলেছেন—'ছোটগল্প লিখতে আমার সাহসে কুলোয়নি। ছোটগল্পের যে ওস্তাদি তা আমার আয়ত্তে ছিল না। ছোটগল্পের আর্ট উপন্যাসের চেয়ে কম কঠিন নয়। তার প্রস্তুতিও ভিন্ন। ছোটগল্পের দাবী এমন যে চেখভের মতো অত বড়ো শিল্পী একখানিও উপন্যাস লেখেননি।'[২] আসলে বড়োগল্প, মেজোগল্প, ছোটোগল্প সম্পর্কে যে ধারণা লেখকের ছিল তার মূলকথা গল্পে থাকতে হবে চমৎকারিত্ব। শুধুগল্প হলেই চলে না। তাতে শিল্পগুণই আসল কথা। দেড়শো পৃষ্ঠার বড়োগল্প লিখলে তা যদি আর্ট না হয় তাহলে সেই গল্পের সার্থকতা কী? বড়ো গল্প লেখার উপাদান চারদিকে ছড়িয়ে থাকলেও সবচেয়ে বেশি লক্ষ রাখা হবে মাত্রাবোধ। সীমার ভিতর অসীমকে পুরতে হবে। অসামান্য কৃতিত্বের ছাপ বাংলা ছোটোগল্পে আছে। ছোটোগল্প স্বল্পপরিসর আয়তনে যেমন রসোত্তীর্ণ বড়োগল্পও কিন্তু স্বাভাবিক পরিসরের পরিধি লঙ্ঘন না করেও সার্থক। বড়ো ও ছোটোগল্পের মাঝামাঝি একটা ধর্ম মেজোগল্প। জীবনে এমন কিছু ঘটনা থাকে যা শিল্পরূপ দিতে গেলে ছোটোগল্পের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। আর বড়োগল্পের আমলে আসে না। ঘটনার পরিসর তো আয়তন মেনে চলে না। যে ঘটনা যতটুকু পরিসরে তৃপ্ত তাকে ততটুকু পরিসরে শিল্পরূপ দিতে হয়। অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় মেজোগল্পের রসের বিস্তার। ছোটোগল্পই হোক মেজোগল্পই হোক আর বড়ো গল্পই হোক—মূলত সেটা গল্প। শৈল্পিক উৎকর্ষতায় রসোত্তীর্ণ হওয়াই মূলকথা। অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায় ছোটো, মেজো, বড়ো তিন ধরনেরই গল্প রয়েছে। কোনো কোনো গল্প তো বীজাকার উপন্যাসও। ভাণ্ডারের শুরু থেকে শেষ নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি বাণিজ্যিক স্বার্থে বা পাঠকের মন যুগিয়ে গল্প লেখেননি। গল্প লিখেছেন নিজের খেয়ালে। পাঠক তাঁর গল্প পাঠে প্রস্তুত হোক বা না হোক। তিনি জানেন পাঠককে তাঁর গল্প পাঠে মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ পাঠকের কথা ভেবে গল্প লেখেননি। শিল্পের দায়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর *গল্প* ১৯৬০ সালে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থটিতে যে গল্পগুলি রয়েছে তা তিনটি গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। *যৌবনজ্বালা/প্রথমার্ধ* (১৯২৯-১৯৩০) *যৌবনজ্বালা/দ্বিতীয়ার্ধ* (১৩৫৭), *প্রকৃতির পরিহাস*(১৯৩৪), *মনপবন*(১৩৫৩)। এই গল্পগ্রন্থগুলিতে অর্থাৎ *গল্প* নামক সংকলন গ্রন্থে পঁচিশটি গল্প স্থান পেয়েছে। এই পর্বের গল্পগুলি মূলত ঘটনাপ্রধান। তবে সপ্রাণ বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে অনবদ্য। মানুষের চরিত্র, সামাজিক জীবনের নানান দিক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেম, ভালোবাসা, সত্য, সৌন্দর্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছিলেন। ভাবনার গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। কোনো এক বিশেষ উপলব্ধিতে বাস্তবের ভিতরে

প্রবেশের জন্য ছটফট করছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাগুলো গভীরে প্রবেশ করতে চাইছিল। তিনি বলেছেন—'বিভিন্ন বয়সে আমি বিভিন্ন ধরনের গল্প লিখেছি। দশ বারো বছর অন্তর অন্তর আমার লেখার ধারা বদলে গেছে। এটা কেবল বাইরের দিক থেকে নয়। ভিতরের দিক থেকেও।'[৩] গল্প রচনার ক্ষেত্রে লেখক যে ভিতরের দিকে প্রবেশ করলেন তা *কথা* (১৯৭১) সংকলন গ্রন্থের গল্প গ্রন্থগুলির গল্পের দিকে তাকালে বোঝা যাবে। *কথা* সংকলন গ্রন্থের পাঁচটি গল্পগ্রন্থে—*কামিনী কাঞ্চন*, (১৯৫০-১৯৫৪), *রূপের দায়* (১৯৫৪-৫৬), *মীন পিয়াসী* (১৯৫৯-৬২), *বর* (১৯৬৩-৬৬), *জন্মদিনে*, (১৯৬৭-১৯৭০) মোট একচল্লিশটি গল্প স্থান পেয়েছে। এই পর্বের গল্পগুলিতে কোনো এক বিশেষ উপলব্ধিকে প্রাধান্য দিলেন যা অন্তর্জগতের কথা বলবে। ভাবনার পরিসর সুদূরপ্রসারী। গল্পগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বিভিন্ন দিক থেকে সত্য প্রেম-সৌন্দর্যের বিচিত্র ভাব ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেল। শুধু বাইরের সৌন্দর্যে নয়, অন্তঃসৌন্দর্য বিশ্লেষণে অনেক গল্পই হয়ে উঠল মূল্যবান। দেশ-কালের নানান ঘটনামূলক পরিস্থিতির সবিশেষ ব্যাখ্যাও পেলাম। *কথা* সংকলন গ্রন্থের গল্পগুলিতে গল্পকারের যে ভাবনার বহিঃপ্রকাশ তার স্রোত বাহিত হয়েছে *কাহিনী* (১৯৮০) সংকলন গ্রন্থেও। *কাহিনীর* গল্পগুলি ১৯৭০-১৯৭৬ এই সময়ের মধ্যে লেখা। এখানে একুশটি গল্প নিয়েই *কাহিনী* গল্প সংকলন। এই সংকলনের গল্পগুলির অনেক গল্পেই আত্মজীবনের ছাপ পড়েছে। তবে পূর্বে লেখা গল্পগুলিতে যে একেবারেই ছিল না তা নয়। লেখকের আত্মজিজ্ঞাসায় ও বিশ্লেষণে গল্পগুলি পাঠকদের কাছে পরম আদরণীয়। অন্তর্দর্শনের প্রতিফলন গল্পগুলিকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। গল্পসমগ্রের পরিশিষ্ট অংশে চারটি গল্প স্থান পেয়েছে। সেগুলি কোনো সংকলনগ্রন্থে স্থান পায়নি। এর মধ্যে তিনটি ছোটোদের জন্য লেখা। আর একটি গল্প *নীলনয়নীর উপাখ্যান* কল্পনার সাথে এক বিবেক জর্জরিত কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী অন্তর্দৃষ্টিমূলক গল্প।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। কিছু কিছু গল্পে এমন সুগভীর ভাবনা অন্তর্দর্শনে বিশ্লেষিত হয়েছে যে সেগুলি এক একটি উপন্যাসের আকার নিতে পারত। অর্থাৎ তিনি স্বল্প পরিসরে এত বেশি খোরাক দিতে পারেন। যেমন *হাসন সখী*, *মীন পিয়াসী*, *হাজার দুয়ারী* প্রভৃতি।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে দক্ষ আই. সি. এস. প্রশাসক হিসেবে প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর ভারতে কাজ করেছেন। তাই পার্টিশন সম্পর্কে তার সুচিন্তিত মতামতও গল্পগুলিকে অনন্যতা দিয়েছে। আত্মজীবনের ক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশা ও যোগাযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল শাসকগোষ্ঠী ও অফিসার মহলের লোকজনের সঙ্গে। অবশ্য স্বাধীনতা আন্দোলনকারী অনেকের সঙ্গেও। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরি গান্ধিজি তার কাছের মানুষ। ইউরোপীয় সভ্যতাকে চাক্ষুষ করেছেন। ফলস্বরূপ লেখকের গল্পের চরিত্রগুলি জ্ঞানচর্চায় বা বিষয়ভাবনায় একটু উন্নত পর্যায়ের। শ্রমজীবী বা নিম্নবিত্ত

শ্রেণির মানুষ তাঁর গল্পে চরিত্র হিসেবে খুবই কম। এমনকী নেই বললেই চলে। কিন্তু তিনি বিষয়ভাবনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, চিন্তা চেতনায় গল্পে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন—তা দেশের সকল শ্রেণির সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে চরিত্ররা কথা বলেছেন কোনো না কোনো সমস্যা নিয়ে—সেই সমস্যা সকলের সকল শ্রেণির মানুষের। আসলে তিনি প্রশাসক হিসেবে সাহিত্যিক হিসেবে মানবতাবাদী, হৃদয়জীবী জীবনশিল্পী। সেখানে জাতপাত, ধনী-গরিব, দেশ-কাল নির্বিশেষে সকলের সমান অধিষ্ঠান। কিন্তু গল্পের চরিত্র সকলকেই করেননি। তাঁর মুষ্টিমেয় চরিত্র অগণিত মানুষের কথা ভেবেছে। গল্প উপস্থাপনের ভঙ্গিটিও অসাধারণ। বেশিরভাগ গল্পের মধ্যেই রয়েছে আর একটি গল্প। দুজন বা তিনজনের কথাবার্তায় কোনো বিষয়ে আলোচনাকে কেন্দ্র করে গল্প শুরু করেন। কিন্তু একটু পরেই আলোচনার মধ্যেই অন্য কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে গল্পটি চলতে থাকে। উদ্দেশ্য দ্বিতীয় অংশে গল্প বলা। প্রথম অংশে যেন তার প্রস্তুতি। যেমন *অপ্সরা, জীবনে যে কথা বলিনি, হাজার দুয়ারি* প্রভৃতি। গল্পগুলির মধ্যে নাটকীয়তা বিশেষ আকর্ষণীয়। গল্পকার যেন শ্রোতার ভূমিকায় চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে অন্য চরিত্রের কাছে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে গল্পটি বের করে আনেন। মানুষ যেমন বৈঠকি ঢঙে আলাপচারিতায় মগ্ন, বেশিরভাগ গল্প সেখান থেকেই উঠে আসা। আলাপচারিতায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেদের কথা বলতে গিয়েই কখনো গল্প, আবার কখনো আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেননি এমন ব্যক্তির কথা স্মৃতিসূত্রে টেনে এনে গল্প। যেখানেই যেভাবে উপস্থাপন করেছেন সেখানেই গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। শব্দ প্রয়োগ ও নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো গোড়ামি দ্বারা চালিত হননি। চলিত বাংলা শব্দ, দেশি শব্দ, বাংলা হরফে ইংরেজি শব্দ, অন্যান্য বিদেশি শব্দের অনায়াস প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তৎসম শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও যুক্তাক্ষরের প্রবণতা খুবই কম। অলংকরণের ব্যবহার তো আছেই। সর্বোপরি বাক্যগঠনে সহজ সরল গদ্যই ব্যবহার করেছেন। গভীর ভাবকে সহজ সরল গদ্যে প্রকাশ করার অসাধারণ দক্ষতা অন্নদাশঙ্করের ছিল। আসলে আধুনিক ও সহৃদয় সামাজিকের লক্ষণ নিয়ে তাঁর গল্পের ভিত তৈরি করেছেন। বিষয়গত ও আঙ্গিকগত দিক থেকে ছোটো গল্পগুলির মধ্যে ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। অন্নদাশঙ্কর রায় গল্প সম্পর্কে দীর্ঘ অভিমতে স্বতস্ফূর্তভাবেই যা বলেছেন তাতেই গল্পকার অন্নদাশঙ্করের চিন্তন সামগ্রিক ভাবে মূল্যায়ন করতে পারব। তিনি বলেছেন—'গল্পের এনটারটেনিং ভ্যালু সম্পর্কে আমার আগ্রহ চিরকালই কম, ফলে প্রকৃতির পরিহাস পর্যায়ের ব্যঙ্গ, কৌতুক কমিয়ে ক্রমে (প্রকৃতির পরিহাস পর্যায়ের পর আটবছর গল্প বিরতির শেষে) আরও গভীরে যেতে চেষ্টা করলুম। তখন লেখা হল কামিনীকাঞ্চন রূপের দায়। এসব গল্পে বিভিন্ন ইমোশনের প্রাধান্য ঘটল। এরপর আমি অনুভব করলাম আমার গল্পের উপজীব্য হবে কোনো না কোনো বিশেষ উপলব্ধি। গল্পে শুধুই কাহিনী ও বর্ণনা নয়। একটা অন্তর্দর্শনেরও প্রতিফলন থাকবে।